সূরা আন-নূরঃ ১ম রুকুঃ (১-১০)আয়াত

Sisters'Forum In Islam.com

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةٌ أَنزَلْنَـٰهَا وَفَرَضْنَـٰهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآ ءَايَـٰتٍۭ بَيِّنَـٰتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ١ : ٢٤

১. এটা একটি সূরা, এটা আমরা নাযিল করেছি এবং এর বিধানকে আমরা অবশ্য পালনীয় করেছি, আর এতে আমরা নাযিল করেছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

কুরআন কারীমের সমস্ত সূরাই আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু এই সূরার ব্যাপারে বিশেষভাবে এ কথা বলার তাৎপর্য হল, এ সূরায় আলোচিত বিধি-বিধানের বিশেষ গুরুত্ব আছে।

এমন এক সত্ত্বা এটি নাযিল করেছেন যার মুঠোর মধ্যে রয়েছে তোমাদের প্রাণ ও কিসমত এবং তোমরা মরেও যার পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারবে না।

দ্বিতীয় বাক্যাংশে বলা হয়েছে, এ সূরায় যেসব কথা বলা হয়েছে সেগুলো "সুপারিশ" পর্যায়ের জিনিস নয়। তোমার ইচ্ছা হলে মেনে নিলে অন্যথায় যা ইচ্ছা তাই করতে থাকলে, ব্যাপারটা তেমন নয়। বরং এটি হচ্ছে অকাট্য ও চূড়ান্ত বিধান। এ বিধান মেনে চলা অপরিহার্য। যদি তুমি মু' মিন ও মুসলিম হয়ে থাকো, তাহলে এ বিধান অনুযায়ী কাজ করা তোমার জন্য ফরয।

তৃতীয় বাক্যাংশে বলা হয়েছে, এ সূরায় যেসব নির্দেশ দেয়া হচ্ছে তার মধ্যে কোন অস্পষ্টতা নেই। পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট নির্দেশনামা। এগুলো সম্পর্কে তোমরা এ ওজর পেশ করতে পারবে না যে, অমুক কথাটি বুঝতে পারিনি কাজেই সেটিকে কেমন করে কার্যকর করতাম?

যে মহান ঘোষণার পরে আইনগত বিধান শুরু হয়ে যায় এই হচ্ছে তার ভূমিকা (Preamble)। সূরা নূরের বিধানগুলো মহান আল্লাহ কত গুরুত্ব সহকারে পেশ করছেন এ ভূমিকার বর্ণনাভঙ্গী নিজেই তা জানিয়ে দিচ্ছে। আইন-বিধান সম্বলিত অন্য কোন সূরার ভূমিকা এত বেশী জোরদার নয়।

সূরা আল-আহযাব (৩৩ নং সূরা), আয়াত ৩৬:

"আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো বিষয়ে ফয়সালা দিলে কোনো মুমিন পুরুষ বা নারীর নিজস্ব কোনো এখতিয়ার থাকে না এবং কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।"

وَّلَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِىْ دِيْنِ اللهِ اِنْ ﴿اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ٢ : ٢٤
وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

২. ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী– তাদের প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত করবে, আল্লাহর বিধান কার্যকরীকরণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ এবং আখেরাতের উপর ঈমানদার হও; আর মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।

তৃতীয় হিজরীতেই তো যিনাকে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ গণ্য করা হয়েছিল। কিন্তু তখনো পর্যন্ত এটি একটি আইনগত অপরাধ ছিল না। রাষ্ট্রীয় পুলিশ ও বিচার বিভাগ এর বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতো না। বরং তখন এটি ছিল একটি "সামাজিক" বা "পারিবারিক" অপরাধ। পরিবারের লোকদেরই এর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করার ইখতিয়ার ছিল। হুকুম ছিল,

যদি চার জন সাক্ষী এই মর্মে সাক্ষ্য দেয় যে, তারা একটি পুরুষ ও একটি মেয়েকে যিনা করতে দেখেছে তাহলে তাদের দু' জনকে মারধর করতে হবে এবং মেয়েটিকে গৃহবন্দী করতে হবে। এ সঙ্গে এ ইশারাও করে দেয়া হয়েছিল যে, ''পরবর্তী হুকুম'' না দেয়া পর্যন্ত হুকুমটি জারি থাকবে। আসল আইন পরে আসছে। এর আড়াই তিন বছর পর সূরা নূরের এ আয়াত নাযিল হয়। কাজেই এটি আগের হুকুম রহিত করে যিনাকে একটি রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ যোগ্য (Cognizable Offence) আইনগত অপরাধ গণ্য করে।

ব্যভিচারের প্রারম্ভিক শাস্তি; যা ইসলামে অস্থায়ীভাবে নির্ধারণ করা হয়েছিল তা সূরা নিসার ১৫নং আয়াতে আলোচিত হয়েছে। ''আর তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচার করে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য থেকে চারজন সাক্ষী তলব করবে। যদি তারা সাক্ষ্য দেয় তবে তাদেরকে ঘরে অবরুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু হয় বা আল্লাহ তাদের জন্য অন্য কোন ব্যবস্থা করেন''. সূরা নিসা:১৫নং

(তাতে বলা হয়েছে যে, যতক্ষণ এ ব্যাপারে কোন স্থায়ী শাস্তি নির্ধারিত করা না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই সমস্ত ব্যভিচারিণী মহিলাদেরকে ঘরে আবদ্ধ রাখা হোক। কিন্তু যখন সূরা নূরের এই আয়াত অবতীর্ণ হল, তখন নবী (সাঃ) বললেন যে, 'আল্লাহ যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেই মত ব্যভিচারী পুরুষ ও নারীর স্থায়ী শাস্তি নির্ধারিত করে দিয়েছেন, তা তোমরা আমার কাছ হতে শিখে নাও। আর তা হল, অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য একশত বেত্রাঘাত ও বিবাহিত নারী-পুরুষের জন্য একশত বেত ও পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলা।' (সহীহ মুসলিম, দন্ডবিধি অধ্যায়) অতঃপর বাস্তবে তিনি বিবাহিত (ব্যভিচারী)-দের শাস্তি দিয়েছেন পাথর মেরে, আর একশত বেত্রাঘাত (যা ছোট শাস্তি) বড় শাস্তির সাথে একত্রীভূত করে বিলুপ্ত করেছেন। অতএব এখন বিবাহিত নারী-পুরুষের ব্যভিচারের একমাত্র শাস্তি পাথর মেরে শেষ করে ফেলা।

ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া তামিমী (রহ.) ..... উবাদাহ্ ইবনু সামিত (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা আমার কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর, তোমরা আমার কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা' আলা মহিলাদের জন্য একটি পন্থা বের করেছেন। যদি কোন অবিবাহিত পুরুষ কোন কুমারী মেয়ের সাথে ব্যভিচার করে তবে একশ' বেত্রাঘাত কর এবং এক বছরের জন্য নির্বাসন দাও। আর যদি বিবাহিত ব্যক্তি কোন বিবাহিতা মহিলার সঙ্গে ব্যভিচার করে, তবে তাদেরকে প্রথমত একশ' বেত্রাঘাত করবে, এরপর পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করবে। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৪২৬৭, ইসলামিক সেন্টার ৪২৬৭)

রজম সম্পর্কে--------

৪৪১৫। উবাদাহ ইবনু সামিত (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা আমার থেকে গ্রহণ করো। আল্লাহ তাদের জন্য বিধান দিয়েছেনঃ বিবাহিত পুরুষ ও বিবাহিতা নারী অপরাধী প্রমাণিত হলে, তাদের শাস্তি হলো একশো বেত্রাঘাত ও পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা। আর অবিবাহিত পুরুষ ও অবিবাহিতা নারীর শাস্তি হলো একশো বেত্রাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন। মুসলিম, ইবনু মাজাহ, দারিমী, আহমাদ। সুনান আবূ দাউদ (আলবানী একাডেমী

جلد শব্দের অর্থ মারা। [ফাতহুল কাদীর] جلد শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, এই বেত্রাঘাতের প্রতিক্রিয়া চামড়া পর্যন্তই সীমিত থাকা চাই এবং মাংস পর্যন্ত না পৌঁছা চাই। [বাগভী] একশ বেত্রাঘাতের উল্লেখিত শাস্তি শুধু অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য নির্দিষ্ট; বিবাহিতদের শাস্তি প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা। [সা' দী] হাদীসে এসেছে, দু' জন লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বিবাদে লিপ্ত হলো। তাদের একজন বললঃ আপনি আমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব দিয়ে ফয়সালা করে দিন। অপরজন (যে তাদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে জ্ঞানী ছিল সে) বললো: হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদের মাঝে ফয়সালা করে দিন এবং আমাকে কথা বলার অনুমতি দিন। তিনি বললেনঃ বল।

লোকটি বললঃ আমার ছেলে এ লোকের কাজ করতো। তারপর সে তার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করে বসে। লোকেরা আমাকে বললো যে, আমার ছেলের উপর পাথর মেরে হত্যা করার হুকুম রয়েছে। তখন আমি একশত ছাগল এবং একটি দাসীর বিনিময়ে আমার ছেলেকে ছাড়িয়ে আনি। তারপর আমি জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করলে তারা বললো যে, আমার সন্তানের উপর ১০০ বেত্রাঘাত এবং একবছরের দেশান্তর। পাথর মেরে হত্যা তো তার স্ত্রীর উপরই। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমার

ছাগল ও দাসী তোমার কাছে ফেরৎ যাবে। তারপর তিনি তার ছেলেকে ১০০ বেত্রাঘাত এবং এক বছরের দেশান্তরের শাস্তি দিলেন এবং উনাইস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেনঃ এ দ্বিতীয় ব্যক্তির স্ত্রীর নিকট যাও। যদি সে স্বীকারোক্তি দেয় তবে তাকে পাথর মেরে হত্যা কর। পরে মহিলা স্বীকারোক্তি করলে তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হয়। [বুখারী: ৬৬৩৩, ৬৬৩৪, মুসলিম: ১৬৯৭, ১৬৯৮]

অনুরূপভাবে উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বরে উপবিষ্ট অবস্থায় বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্যসহ প্রেরণ করেন এবং তার প্রতি কিতাব নাযিল করেন। কিতাবে যেসব বিষয় নাযিল করা হয়, তন্মধ্যে প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধানও ছিল, যা আমরা পাঠ করেছি, স্মরণ রেখেছি এবং হৃদয়ঙ্গম করেছি। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও প্রস্তরাঘাতে হত্যা করেছেন এবং তার পরে আমরাও করেছি। এখন আমি আশংকা করছি যে, সময়ের চাকা আবর্তিত হওয়ার পর কেউ একথা বলতে না শুরু করে যে, আমরা প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধান আল্লাহর কিতাবে পাই না। ফলে সে একটি দ্বীনী কর্তব্য পরিত্যাগ করার কারণে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে, যা আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেছেন। মনে রেখো, প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধান আল্লাহর কিতাবে সত্য এবং বিবাহিত পুরুষ ও নারীর প্রতি প্রযোজ্য- যদি ব্যভিচারের শরীয়তসম্মত সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত হয় অথবা গর্ভ ও স্বীকারোক্তি পাওয়া যায়। [বুখারীঃ ৬৮২৯, মুসলিমঃ ১৬৯১]

পরবর্তীকালের ফকীহগণ ও উলামাবৃন্দ এ ব্যাপারে একমত ছিলেন এবং এখনো একমত আছেন। শুধুমাত্র খাওয়ারিজ সম্প্রদায় পাথর ছুঁড়ে মারার এই শাস্তিকে অস্বীকার করে। ভারত উপমহাদেশেও আজকাল এমন কিছু মানুষ আছে, যারা উক্ত শাস্তির কথা মানতে অস্বীকার করে থাকে। এই অস্বীকার করার মূল কারণ হাদীস অস্বীকার করা। কারণ পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলার শাস্তি সহীহ ও শক্তিশালী হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং সেই সমস্ত হাদীসের বর্ণনাকারীর সংখ্যাও এত বেশি যে, উলামাবৃন্দ সেগুলোকে 'মুতাওয়াতির' (বর্ণনা-পরম্পরা-বহুল) হাদীস বলে গণ্য করেছেন। বলা বাহুল্য, হাদীসের প্রামাণিকতা ও তা শরীয়তের একটি উৎস হওয়ার কথা যাঁরা স্বীকার করেন, তাঁরা উক্ত শাস্তির বিধানকে অস্বীকার করতে পারেন না।

() ব্যভিচারের শাস্তি অত্যন্ত কঠোর বিধায় শাস্তি প্রয়োগকারীদের তরফ থেকে দয়াপরবশ হয়ে শাস্তি ছেড়ে দেয়ার কিংবা হ্রাস করার সম্ভাবনা আছে। [সা' দী] তাই সাথে সাথে আদেশ দেয়া হয়েছে যে, দ্বীনের এই গুরুত্বপূর্ণ বিধান কার্যকর কারণে অপরাধীদের প্রতি দয়াপরবশ হওয়া বৈধ নয়। [দেখুন: ইবন কাসীর, বাগভী, তাবারী]

"কিয়ামতের দিন একজন শাসককে আনা হবে। সে হদের মধ্যে বেত্রাঘাতের সংখ্যা এক ঘা কমিয়ে দিয়েছিল। জিজ্ঞেস করা হবে, এ কাজ তুমি কেন করেছিলে? জবাব দেবে, আপনার বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহশীল হয়ে। আল্লাহ বলবেনঃ আচ্ছা, তাহলে তাদের ব্যাপারে তুমি আমার চেয়ে বেশী অনুগ্রহশীল ছিলে? তারপর হুকুম হবে, নিয়ে যাও একে দোযখে। আর একজন শাসককে আনা হবে। সে বেত্রাঘাতের সংখ্যা ১টি বাড়িয়ে দিয়েছিল। জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি এ কাজ করেছিলে কেন? সে জবাব দেবে, যাতে লোকেরা আপনার নাফরমানি করা থেকে বিরত থাকে। আল্লাহ বলবেনঃ আচ্ছা, তাদের ব্যাপারে তুমি তাহলে আমার চেয়ে বেশী বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান ছিলে? তারপর হুকুম হবে, নিয়ে যাও একে দোযখে। (তাফসীরে কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২২৫ পৃষ্ঠা)

বুখারী ও মুসলিমে হযরত আয়েশার (রাঃ) একটি রেওয়ায়াত উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, নবী ﷺ এক ভাষণে বলেনঃ "হে লোকেরা! তোমাদের পূর্বে যেসব উম্মত অতিক্রান্ত হয়েছে তারা এজন্য ধ্বংস হয়ে গেছে যে, তাদের কোন মর্যাদাশালী ব্যক্তি চুরি করলে তারা তাকে ছেড়ে দিতো এবং কোন দুর্বল ব্যক্তি চুরি করলে তাকে শাস্তি দিতো।" অন্য একটি হাদীসে রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেনঃ "একটি হদ্ জারি করা দুনিয়াবাসীর জন্য চল্লিশ দিন বৃষ্টি হবার চাইতেও বেশী কল্যাণকর।" (নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

() অর্থাৎ ঘোষণা দিয়ে সাধারণ লোকের সামনে শাস্তি দিতে হবে। এর ফলে একদিকে অপরাধী অপদস্থ হবে এবং অন্যদিকে সাধারণ মানুষ শিক্ষা লাভ করবে। [ফাতহুল কাদীর, কুরতুবী, সা' দী] যাতে মানুষের শিক্ষা গ্রহণ যা শাস্তিদানের আসল উদ্দেশ্য তা ব্যাপকতা লাভ করে। (শাস্তি দেখে অন্যরা উপদেশ নিতে পারে এবং এমন কাজে পা বাড়াতে ভয় পায়।) ভাগ্যচক্রে আজকাল জন-সমক্ষে শাস্তি দেওয়াকে মানবাধিকার বিরোধী বলে প্রচার করা হচ্ছে। এটি সম্পূর্ণ মূর্খতা, আল্লাহর আদেশের প্রতি বিদ্রোহ এবং তাদের ধারণা মতে তারা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর থেকে বেশি মানুষের হিতাকাঙ্ক্ষী ও মঙ্গলকামী হতে চাওয়া। অথচ প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ অপেক্ষা অধিক করুণাময় ও দয়াবান আর কেউ নেই।

সূরা আল মায়েদায় চুরির শাস্তি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّٰهِ "তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে অপরাধ প্রতিরোধক শাস্তি।" (৩৮ আয়াত) আর এখানে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, যিনাকারীকে প্রকাশ্য লোকদের সামনে শাস্তি দিতে হবে। এ থেকে জানা যায়, ইসলামী আইনে শাস্তির তিনটি উদ্দেশ্য।

এক, অপরাধী থেকে তার জুলুম ও বাড়াবাড়ির প্রতিশোধ নিতে হবে এবং সে অন্য ব্যক্তি বা সমাজের প্রতি যে অন্যায় করেছিল তার কিছুটা স্বাদ তাকে আস্বাদন করিয়ে দিতে হবে।

দুই, তাকে পুনর্বার অপরাধ করা থেকে বিরত রাখতে হবে।

তিন, তার শাস্তিকে শিক্ষণীয় করতে হবে, যাতে সমাজের খারাপ প্রবণতার অধিকারী অন্য লোকদের মগজ ধোলাই হয়ে যায় এবং তারা যেন এ ধরনের কোন অপরাধ করার সাহসই না করতে পারে।। এছাড়াও প্রকাশ্যে শাস্তি দেবার আর একটি লাভ হচ্ছে এই যে, এ অবস্থায় শাসকরা শাস্তি দেবার ক্ষেত্রে অহেতুক সুবিধা দান বা অহেতুক কঠোরতা প্রদর্শন করার সাহস না দেখাতে পারে।

কোন ব্যক্তিকে অপরাধী সাব্যস্ত করার জন্য কেবলমাত্র সে যিনা করেছে এতটুকু যথেষ্ট নয়। বরং এজন্য অপরাধীর মধ্যে কিছু শর্ত পাওয়া যেতে হবে। নিছক যিনার ক্ষেত্রে এ শর্তগুলো এক ধরনের এবং বিবাহিতের যিনার ক্ষেত্রে এগুলো আবার ভিন্ন ধরনের।

নিছক যিনার ক্ষেত্রে এ শর্তগুলো হচ্ছে, অপরাধী হবে জ্ঞান সম্পন্ন ও প্রাপ্ত বয়স্ক। যদি কোন বুদ্ধিভ্রষ্ট পাগল বা শিশু এ কর্ম করে তাহলে তার ওপর যিনার শাস্তি প্রযুক্ত হবে না।

বিবাহিতের যিনার জন্য প্রাপ্ত বয়স্ক ও জ্ঞান সম্পন্ন হবার সাথে সাথে আরো কয়েকটি শর্তও রয়েছে। নিচে এগুলো বর্ণনা করছিঃ

প্রথম শর্ত হচ্ছে, অপরাধীকে স্বাধীন হতে হবে। এ শর্তটির ব্যাপারে সবাই একমত। কারণ কুরআন নিজেই ইঙ্গিত করছে, গোলামকে রজমের শাস্তি দেয়া যাবে না। একটু আগেই একথা আলোচনা হয়েছে যে, বাঁদী যদি বিয়ের পর যিনায় লিপ্ত হয় তাহলে তাকে অবিবাহিতা স্বাধীন নারীর তুলনায় অর্ধেক শাস্তি দেয়া উচিত। ফকীহগণ স্বীকার করেছেন কুরআনের এ বিধানটিই গোলামের ওপরও প্রযুক্ত হবে।

দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে, অপরাধীকে যথারীতি বিবাহিত হতে হবে। এ শর্তটির ব্যাপারেও সবাই একমত। আর এ শর্তটির প্রেক্ষিতে যে ব্যক্তি নিজের বাঁদীর সাথে যৌন সম্পর্ক করেছে অথবা যার বিয়ে হয়েছে কোন গর্হিত পদ্ধতিতে, তাকে বিবাহিত গণ্য করা হবে না। অর্থাৎ সে যদি যিনা করে তাহলে তাকে রজম নয় বরং বেত্রাঘাতের শাস্তি দেয়া হবে।

তৃতীয় শর্তটি হচ্ছে, তার নিছক বিয়েই যথেষ্ট নয় বরং বিয়ের পর সঠিক অর্থে স্বামী-স্ত্রীর নিভৃত মিলনও হতে হবে। নিছক বিবাহ অনুষ্ঠান কোন পুরুষকে বিবাহিত এবং কোন নারীকে বিবাহিতা করে না যার ফলে যিনা করার কারণে তাদেরকে রজম করা যেতে পারে। এ শর্তটির ব্যাপারেও অধিকাংশ ফকীহ একমত। তবে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মাদ (র) এর মধ্যে আরো এতটুকু সংযোজন করেন যে, একজন পুরুষ ও নারীকে কেবলমাত্র তখনই বিবাহিত গণ্য করা হবে যখন বিয়ে ও নিভৃত মিলনের সময় স্বামী স্ত্রী উভয়ই স্বাধীন, প্রাপ্ত বয়স্ক ও জ্ঞান সম্পন্ন হবে। এ অতিরিক্ত শর্তের ফলে যেটুকু পার্থক্য দেখা দেয় তা হচ্ছে এই যে, যদি একটি পুরুষের বিয়ে একটি বাঁদী, উন্মাদ বা অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়ের সাথে হয় তাহলে এ অবস্থায় সে নিজের স্ত্রীর সাথে নিভৃত মিলনের স্বাদ গ্রহণ করলেও এরপর যদি সে যিনায় লিপ্ত হয় তাহলে রজমের শাস্তি লাভের অধিকারী হবে না। নারীর ব্যাপারেও এ একই কথা। সে তার গোলাম, উন্মাদ বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক স্বামীর সাথে যৌন মিলনের স্বাদ গ্রহণ করলেও এর পরে যদি সে যিনায় লিপ্ত হয় তাহলে রজমের শাস্তি লাভের অধিকারী হবে না। ভেবে দেখলে বুঝা যাবে, এই দু' জন বিচক্ষণ প্রতিভাবান ইমামের এই বর্ধিত শর্তটি অত্যন্ত যুক্তিসংগত।

চতুর্থ শর্তটি হচ্ছে, অপরাধীকে মুসলমান হতে হবে। এ ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম শাফেঈ, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম আহমাদও শর্তটি মানেন না। তাঁদের মতে অসুমলিমও যদি বিয়ে করার পর যিনায় লিপ্ত হয় তাহলে তাকে রজম

করা হবে। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালেক এ বিষয়ে একমত যে, একমাত্র মুসলমানকেই বিয়ে করার পর যিনায় লিপ্ত হলে রজমের শাস্তি দেয়া যেতে পারে। এর যেসব যুক্তি তাঁরা দেখিয়েছেন তার মধ্যে সবচেয়ে সঙ্গত ও গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি হচ্ছে, এক ব্যক্তিকে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুর মতো ভয়াবহ শাস্তি দেবার জন্য অপরিহার্য হচ্ছে এই যে, সে পূর্ণ "বিবাহিতা" অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও যিনা থেকে বিরত হয় না।

বিবাহিত মানে হচ্ছে "নৈতিক দূর্গ পরিবেষ্টিত।" আর তিনটি প্রাচীর এ পরিবেষ্টনকে পূর্ণতা দান করে।

প্রথম প্রাচীর হচ্ছে, মানুষকে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনতে হবে। আখেরাতের জবাবদিহির প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে এবং আল্লাহর শরীয়াতকে স্বীকার করতে হবে।

দ্বিতীয় প্রাচীর হচ্ছে, তাকে সমাজের স্বাধীন ব্যক্তি হতে হবে। সে কারোর গোলাম হবে না। কারণ মালিকের বিধি-নিষেধ মেনে নিয়ে নিজের কামনা পূর্ণ করতে গিয়ে তাকে বৈধ উপায় অবলম্বনে বাধা পেতে হয় এবং এর ফলে অক্ষমতা তাকে গোনাহে লিপ্ত করতে পারে। কোন পরিবারও তার চরিত্র ও মান-সম্মান রক্ষায় সাহায্যকারী হয় না।

আর তৃতীয় প্রাচীর হচ্ছে, তার বিয়ে হয়ে গেছে এবং নিজের কামনা পূর্ণ করার বৈধ উপায় তার করায়ত্ত্ব আছে। এ তিনটি প্রাচীরের অস্তিত্ব যখন বিদ্যমান থাকে তখনই "দূর্গ পরিবেষ্টন" পূর্ণতা লাভ করে।

এবং তখনই যে ব্যক্তি অবৈধ যৌন কামনা চরিতার্থ করার জন্য এ ধরনের তিন তিনটি প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলে সে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যু বরণের যোগ্য গণ্য হতে পারে। কিন্তু যেখানে প্রথম ও সবচেয়ে বড় প্রাচীর অর্থাৎ পরকাল ও আল্লাহর আইনের প্রতি বিশ্বাসই উপস্থিত নেই সেখানে নিশ্চিতভাবেই দূর্গ পরিবেষ্টন পূর্ণতা করেনি এবং এ কারণে চরিত্রহীনতার অপরাধ এমন মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছে যায়নি যা তাকে চরম শাস্তির অধিকারী করে। ইসহাক ইবনে রাহাওয়াহ তাঁর মুসনাদে এবং দারুকুত্নী তাঁর সুনান গ্রন্থে ইবনে উমরের (রা.) যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন সেটি এ যুক্তিকে সমর্থন করে। হাদীসটিতে বলা হয়েছে مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ "যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শির্ক করেছে সে 'মুহসিন' নয়।" যদিও এ হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তির পুনরাবৃত্তি করেছেন, না নিজের মত ব্যক্ত করেছেন। এ ব্যাপারে মতবিরোধ আছে কিন্তু এ দুর্বলতা সত্ত্বেও মূল অর্থের দিক দিয়ে এর বিষয়বস্তু অত্যন্ত শক্তিশালী। এর জবাবে ইহুদীদের একটি মোকদ্দমা থেকে যুক্তি পেশ করা হয় যাতে নবী ﷺ রজম করার বিধান প্রয়োগ করেছিলেন, তাহলে আমি বলবো, এ যুক্তি সঠিক নয়। কারণ ঐ মোকদ্দমা সম্পর্কিত সমস্ত নির্ভরযোগ্য হাদীস একত্র করলে পরিষ্কার জানা যায় যে, সেখানে নবী ﷺ তাদের ওপর ইসলামের প্রচলিত আইন (Law of the Land) নয়, তাদের নিজেদের ধর্মীয় আইন (Personal law) প্রয়োগ করেছিলেন। বুখারী ও মুসলিম একযোগে এ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন যে, যখন এ মোকদ্দমা রসূলের কাছে আনা হলো তখন তিনি ইহুদীদের জিজ্ঞেস করলেনঃ **مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ مِنْ شَأْنِ الرَّجْمِ يَا مَا تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمْ** অর্থাৎ "তোমাদের নিজেদের কিতাব তাওরাতে এর কি বিধান প্রদত্ত হয়েছে? " তারপর যখন একথা প্রমাণ হয়ে গেছে যে, তাদের সমাজে রজমের বিধান আছে তখন তিনি বললেনঃ **فَإِنِّى أَحْكُمُ بِمَا فِى التَّوْرَاةِ** "আমি সেই ফায়সালা দিচ্ছি যা তাওরাতে আছে।" অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে, তিনি এ মোকদ্দমার ফায়সালা দিতে গিয়ে বলেনঃ **اللَّهُمَّ إِنِّى أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ** "হে আল্লাহ! আমি প্রথম ব্যক্তি যে তোমার হুকুমকে জীবিত করেছে যখন তারা তাকে মেরে ফেলেছিল।" (মুসলিম, আবু দাউদ, আহমাদ)

**** **** যিনাকারীকে অপরাধী সাব্যস্ত করার জন্য তার নিজের ইচ্ছায় কাজটি করাও জরুরী। জোর জবরদস্তি যদি কাউকে এ কাজ করতে বাধ্য করা হয়ে থাকে তাহলে সে অপরাধীও নয় এবং শাস্তিরও যোগ্য নয়। এ ব্যাপারে কেবল শরীয়াতের এ সাধারণ নিয়মই প্রযোজ্য হয় না যে, "বলপূর্বক কাউকে দিয়ে কোন কাজ করানো হলে তার যাবতীয় দায়-দায়িত্ব থেকে সে মুক্ত থাকে" বরং এ সূরায়ই সামনের দিকে গিয়ে কুরআন এমন মেয়েদের ক্ষমার কথা ঘোষণা করছে যাদেরকে যিনা করতে বাধ্য করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন হাদীসে এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, বলপূর্বক যিনা করার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র যে বল প্রয়োগ করে যিনা করেছে তাকেই শাস্তি দেয়া হয়েছে এবং যার ওপর বল প্রয়োগ করা হয়েছিল তাকে মুক্তি দেয়া হয়েছে।

তিরমিযী ও আবু দাউদের বর্ণনা হচ্ছে জনৈকা মহিলা অন্ধকারের মধ্যে নামাযের জন্য বের হন। পথে এক ব্যক্তি তাকে পাকড়াও করে বলপূর্বক তার সতীত্ব হরণ করে। তার চিৎকারে লোকেরা দৌড়ে এসে যিনাকারীকে ধরে ফেলে। নবী ﷺ তাকে রজম করান এবং মহিলাটিকে মুক্তি দেন।

বুখারীর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, হযরত উমরের (রাঃ) খিলাফতকালে এক ব্যক্তি একটি মেয়ের সাথে জোরপূর্বক যিনা করে। তিনি লোকটিকে বেত্রাঘাতের শাস্তি দেন এবং মেয়েটিকে ছেড়ে দেন। এসব প্রমাণের ভিত্তিতে নারীদের ব্যাপারে আইনের ক্ষেত্রে ঐকমত্য রয়েছে কিন্তু মতবিরোধ দেখা দিয়েছে পুরুষের ক্ষেত্রে। এ ব্যাপারে ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ, ইমাম শাফেঈ ও ইমাম হাসান ইবনে সালেহ বলেন, পুরুষকেও যদি যিনা করতে বাধ্য করা হয় তাহলে তাকে মাফ করে দেয়া হবে। ইমাম যুফার বলেন, তাকে মাফ করা হবে না। কারণ সে অঙ্গ সঞ্চালন না করলে এ কর্মটি সংঘটিত হওয়াই সম্ভব নয় এবং তার অঙ্গ সঞ্চালনই একথা প্রমাণ করে যে, তার নিজের যৌন কামনা এ কর্মের উদ্যোক্তা হয়েছিল। ইমাম আবু হানীফা বলেন, যদি সরকার বা তার কোন প্রশাসক কোন ব্যক্তিকে যিনা করতে বাধ্য করে থাকে তাহলে যিনাকারীকে শাস্তি দেয়া হবে না। কারণ যখন সরকারই অপরাধ করতে বাধ্য করছে তখন তার শাস্তি দেবার অধিকার থাকে না। কিন্তু যদি সরকার ছাড়া অন্য কেউ বাধ্য করে থাকে তাহলে যিনাকারীকে শাস্তি দেয়া হবে। কারণ নিজের যৌন কামনা ছাড়া অবশ্যই সে যিনা করতে পারে না এবং যৌন কামনা জোরপূর্বক সৃষ্টি করা যেতে পারে না। এ তিনটি বক্তব্যের মধ্যে প্রথম বক্তব্যটিই সবচেয়ে বেশী সঠিক। এর যুক্তি হচ্ছে, অঙ্গ সঞ্চালন যৌন কামনার প্রমাণ হতে পারে কিন্তু সম্মতি ও মানসিক আকাঙ্ক্ষার অপরিহার্য প্রমাণ নয়। মনে করুন, কোন জালেম এক শরীফ ব্যক্তিকে জোর পূর্বক গ্রেফতার করে বন্দি করে এবং তার সাথে একটি সুন্দরী মেয়েকেও উলঙ্গ করে একই কামরায় আটকে রাখে। ঐ মেয়ের সাথে যিনায় লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সে তাকে মুক্তি দেয় না। এ অবস্থায় যদি তারা দু' জন যিনায় লিপ্ত হয়ে যায় এবং ঐ জালেম ঘটনার চার জন্য সাক্ষীসহ তাদেরকে আদালতে হাযির করে, তাহলে তাদের বাস্তব অবস্থায় উপেক্ষা করে তাদরেকে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড দান অথবা বেত্রাঘাত করার শাস্তি কি ন্যায়সঙ্গত হবে? এমন অবস্থা সৃষ্টি হওয়া যুক্তি ও বাস্তবতা--- উভয়ের নিরিখেই সম্ভব যাতে যৌন কামনার উদ্রেক ঘটতে পারে কিন্তু মানুষের নিজের ইচ্ছা ও আগ্রহ তার সহযোগী হয় না। যদি কোন ব্যক্তিকে বন্দী করে কারাগারে আবদ্ধ রেখে তাকে পান করার জন্য শরাব ছাড়া আর কিছুই দেয়া না হয় এবং এ অবস্থায় সে শরাব পান করে, তাহলে নিছক এ যুক্তিতে কি তাকে শাস্তি দেয়া যেতে পারে যে, তার জন্য তো অবশ্যই বাধ্যবাধকতার অবস্থা ছিল ঠিকই কিন্তু নিজের ইচ্ছা ছাড়া তো গলার মধ্য দিয়ে শরাবের তরল পদার্থ সে নীচের দিকে নামাতে পারতো না? অপরাধ ঘটার জন্য কেবলমাত্র ইচ্ছা থাকা যথেষ্ট নয় বরং এজন্য স্বাধীন ইচ্ছার প্রয়োজন। যে ব্যক্তিকে জবরদস্তি এমন এক অবস্থার মুখোমুখি করানো হয় যার ফলে সে অপরাধ করার সংকল্প করতে বাধ্য হয়, সে কোন কোন অবস্থায় তো একেবারেই অপরাধী হয় না এবং কোন কোন অবস্থায় তার অপরাধ অতি সামান্যই হয়ে থাকে।

********* ইসলামী আইন সরকার ছাড়া আর কাউকেই যিনাকারী ও যিনাকারীর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করার ক্ষমতা দেয় না। সে আদালত ছাড়া আর কাউকেই তাদেরকে শাস্তি দেবার অধিকার দেয় না। আলোচ্য আয়াতে ''তাদেরকে বেত্রাঘাত করো'' শব্দাবলীর মাধ্যমে জনগণকে নয় বরং রাষ্ট্রীয় শাসকবৃন্দ ও বিচারপতিগণকে সম্বোধন করা হয়েছে, এ ব্যাপারে উম্মতের সকল ফকীহ একমত। তবে গোলামদের ক্ষেত্রে মতবিরোধ রয়েছে। তার প্রভু এ ব্যাপারে তাকে শাস্তি দিতে পারে কিনা এ প্রশ্নে সবাই একমত নয়। হানাফী মাযহাবের সকল ইমাম এ ব্যাপারে একমত যে, প্রভু গোলামকে শাস্তি দিতে পারে না। শাফেঈ ইমামগণ বলেন, তাদের সে ক্ষমতা আছে। আর মালেকীগণ বলেন, চুরির অপরাধে প্রভু গোলামদের হাত কাটার অধিকার রাখে না কিন্তু যিনা, সতীসাধ্বী নারীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ ও শরাব পানের শাস্তি দিতে পারে।

********* ইসলামী আইন যিনার শাস্তিকে রাষ্ট্রীয় আইনের একটি অংশ গণ্য করে। তাই মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের ওপর এ আইন জারি হবে। এ ব্যাপারে একমাত্র ইমাম মালেক ছাড়া সম্ভবত ইমামদের মধ্য থেকে আর কেউ দ্বিমত প্রকাশ করেননি। রজমের শাস্তি অমুসলিমদের ওপর প্রয়োগ করার প্রশ্নে ইমাম আবু হানীফার যে মতবিরোধ তার ভিত্তি এ নয় যে, এটি রাষ্ট্রীয় আইন নয়। বরং এ মত বিরোধের ভিত্তি হচ্ছে এই যে, তাঁর মতে রজমের শর্তাবলীর মধ্যে যিনাকারীর ''পূর্ণ বিবাহিত'' হওয়া হচ্ছে অন্যতম শর্ত। আর পূর্ণ বিবাহিত হওয়া ইসলাম ছাড়া সম্ভব নয়। তাই তিনি অমুসলিম যিনাকারীকে রজমের শাস্তির আওতা বহির্ভূত গণ্য করেন, বিপরীতপক্ষে ইমাম মালেকের মতে এ হুকুমটি মুসলমানদের জন্য প্রদান করা হয়েছে, কাফেরদের জন্য নয়। তাই তিনি যিনার দণ্ডবিধিকে মুসলমানদের ব্যক্তিগত আইনের (Personal Law) একটি অংশ

গণ্য করেন। আর অন্য দেশ থেকে দারুল ইসলামে অনুমতি নিয়ে আশ্রয় গ্রহণকারীর ব্যাপারে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম শাফেঈ বলেন, সে যদি দারুল ইসলামে যিনায় লিপ্ত হয়, তাহলে তার ওপর যিনার দণ্ডবিধি জারি করা হবে। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মাদ বলেন, আমরা তার ওপর যিনার দণ্ডবিধি জারি করতে পারি না।

********** কোন ব্যক্তি নিজের অপরাধ নিজ মুখে স্বীকার করবে অথবা কারোর যিনার কথা যারা জানতে পারে তারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে শাসকের কাছে অবশ্যই তা পৌঁছাবে, ইসলামী আইন এটা অপরিহার্য গণ্য করে না। তবে শাসকরা যখন এ অপরাধের কথা জানতে পারেন তখন আর সেখানে ক্ষমার কোন অবকাশ থাকে না। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে নবী ﷺ বলেছেনঃ

مَنْ اَتَى شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْقَاذُوْرَاتِ فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ فَاِن اَبْدَى لَنَا صَفْحَتَهُ اَقَمْنَا عَلَيْهِ كِتَابَ اللهِ (احكام القران- للجصاص

“তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তিই এসব নোংরা অপরাধগুলোর মধ্য থেকে কোন একটিতে লিপ্ত হয়ে যায়, সে যেন আল্লাহর পর্দার আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখে। কিন্তু সে যদি আমাদের সামনে পর্দা উঠায়, তাহলে আমরা তার ওপর আল্লাহর কিতাবের আইন প্রয়োগ করেই ছাড়বো” । (আহকামুল কুরআন-জাস্সাস)

আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে, মাঈয ইবনে মালেক আস্লামী অপরাধে জড়িত হয়ে পড়লে হায্যাল ইবনে নু’ আইম তাঁকে বলেন, নবী ﷺ এর কাছে গিয়ে নিজের অপরাধ স্বীকার করো। তাই তিনি গিয়ে রসূলুল্লাহর ﷺ কাছে নিজের অপরাধ বর্ণনা করেন। এর ফলে তিনি একদিকে তাকে রজমের শাস্তি দেন এবং অন্য দিকে হায্যালকে বলেন, **لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ** “যদি তুমি তার ওপর পর্দা ফেলে দিতে, তাহলে তোমার জন্য বেশী ভালো হতো।”

আবু দাউদ ও নাসায়ীতে অন্য একটি হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে নবী ﷺ বলেনঃ

تَعَافَوُا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِى مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ

“শাস্তিযোগ্য অপরাধকে নিজেদের মধ্যে ক্ষমা করে দাও। কিন্তু যে অপরাধের ব্যাপারটি আমার কাছে পৌঁছে যাবে তার শাস্তি বিধান করা ওয়াজিব হয়ে যাবে।

**********যিনার অপরাধের প্রথম সম্ভাব্য প্রমাণ হচ্ছে এই যে, তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। এ সংক্রান্ত আইনের গুরুত্বপূর্ণ অংশসমূহ হচ্ছে নিম্নরূপঃ

(ক) কুরআন সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করে, যিনার জন্য কমপক্ষে চারজন চাক্ষুষ সাক্ষীর প্রয়োজন। সূরা নিসার ১৫ আয়াতে একথা বলা হয়েছে। সামনের দিকে এ সূরা নূরেই দু’ জায়গায় একথা আসছে। সাক্ষী ছাড়া কাযী স্বচক্ষে এ অপরাধ সংঘটিত হতে দেখলেও কেবলমাত্র নিজের জ্ঞানের ভিত্তিতে এ ফায়সালা দিতে পারেন না।

(খ) সাক্ষী হতে হবে এমন সব লোক, ইসলামের সাক্ষ্য আইনের দৃষ্টিতে যারা নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। যেমন, ইতিপূর্বে কোন মামলায় তারা মিথ্যা সাক্ষ্যদানকারী প্রমাণিত হয়নি। তারা খেয়ানতকারী নয়। ইতিপূর্বে তারা কখনো শাস্তি পায়নি। অপরাধীর সাথে যাদের কোন শত্রুতা প্রমাণিত হয়নি ইত্যাদি। মোটকথা অনির্ভরযোগ্য সাক্ষ্যের ভিত্তিতে কাউকে রজম করা বা কারোর পিঠে বেত্রাঘাত করা যেতে পারে না।

(গ) সাক্ষীদের একথার সাক্ষ্য দিতে হবে যে, তারা অভিযুক্ত নারী ও পুরুষকে সঙ্গমরত অবস্থায় চাক্ষুষ দেখেছে অর্থাৎ كَالْمِيلُ فِي الْمُكْحُلَةِ وَالرِّشَاءُ فِى الْبِئْرِ (এমনভাবে যেমন সুর্মাদানীর মধ্যে সুর্মা তোলার শলাকা এবং কুয়ার মধ্যে রশি)।

(ঘ) সাক্ষীদের কবে, কখন, কোথায়, কাকে, কার সাথে যিনা করতে দেখেছে এ ব্যাপারে একমত হতে হবে। এ মৌলিক বিষয়গুলোতে মতবিরোধ ঘটলে তাদের সাক্ষ্য বাতিল হয়ে যাবে।

وَحُرِّمَ ذٰلِكَ ❤ وَّالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَآ اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ • اَلزَّانِىْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً ৩ : ২৪ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ

৩. ব্যভিচারী পুরুষ-ব্যভিচারিণীকে অথবা মুশরিক নারীকে ছাড়া বিয়ে করে না এবং ব্যভিচারিণী নারী, তাকে ব্যভিচারী অথবা মুশরিক ছাড়া কেউ বিয়ে করে না, আর মুমিনদের জন্য এটা হারাম করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে তাফসীরবিদদের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। কোন কোন তাফসীরকারক আয়াতটিকে মনসূখ তথা রহিত বলেন। তাদের মতে আয়াতের ভাষ্য হলো, ব্যভিচারী মহিলাকে বিয়ে করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা। [বাগভী] কোন কোন মুফাস্সির এ হুকুমকে সুনির্দিষ্ট ঘটনার সাথে সম্পর্কযুক্ত মনে করেন। [দেখুন: ইবন কাসীর, কুরতুবী, বাগভী, ফাতহুল কাদীর] আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল 'আস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ সে যুগে এক মহিলার নাম ছিল উম্মে মাহযুল। সে যিনা করত। (বেশ্যা ছিল)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক সাহাবী তাকে বিয়ে করতে চাইলে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন। **[মুসনাদে আহমাদ ২/১৫৯, ২/২২৫, নাসায়ী, কিতাবুত্-তাফসীর, হাদীস নং ৩৭৯, মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ২/১৯৩-১৯৪, বায়হাকী ৭/১৫৩]** অনুরূপ অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, সে যুগে 'আনাক' নাম্নী এক বেশ্যা ছিল, মারসাদ নামীয় এক সাহাবী তাকে বিয়ে করতে চাইলে এ আয়াত নাযিল হয়। [তিরমিযীঃ ৩১৭৭, আবু দাউদঃ ২০৫১, মুস্তাদরাকে হাকোমঃ ২/১৬৬]

অর্থাৎ অ-তাওবাকারী ব্যভিচারীর জন্য ব্যভিচারিণীই উপযোগী অথবা মুশরিক নারী। কোন সৎ মু' মিন নারীর জন্য সে মোটেই উপযোগী পুরুষ নয়। আর মু' মিনদের জন্য জেনে বুঝে নিজেদের মেয়েদেরকে এ ধরনের অসচ্চরিত্র লোকদের হাতে সোপর্দ করা হারাম। এভাবে যিনাকারীনী (অ-তাওবাকারী) মেয়েদের জন্য তাদেরই মতো যিনাকারীরা অথবা মুশরিকরাই উপযোগী। সৎ মুমিনদের জন্য তারা মোটেই উপযোগী নয়। যেসব নারীর চরিত্রহীনতার কথা মু' মিনরা জানে তাদেরকে বিয়ে করা তাদের জন্য হারাম। যে সমস্ত পুরুষ ও নারী তাদের চরিত্রহীনতার পথে গা ভাসিয়ে দিয়েছে একমাত্র তাদের জন্য এ নিয়ম প্রযোজ্য। তবে যারা তাওবা করে নিজেদের সংশোধন করে নিয়েছে তাদের জন্য এটা প্রযোজ্য নয়। কারণ তাওবা ও সংশোধনের পর "যিনাকারী" হবার দোষ আর তাদের জন্য প্রযুক্ত হয় না।

যিনাকারীর সাথে বিয়ে হারাম হবার অর্থ ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল এ নিয়েছেন যে, আদতে তার সাথে বিয়ে অনুষ্ঠিতই হয় না। কিন্তু এক্ষেত্রে সঠিক কথা হচ্ছে, এর অর্থ নিছক নিষেধাজ্ঞা ছাড়া আর কিছুই নয়। এ নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ করে যদি কেউ বিয়ে করে তাহলে আইনগতভাবে তা বিয়েই হবে না এবং এ বিয়ে সত্ত্বেও উভয় পক্ষকে যিনাকারী গণ্য করতে হবে একথা ঠিক নয়। নবী ﷺ একটি সার্বজনীন নিয়ম হিসেবে বলেনঃ الحرام لايحرم الحلال "হারাম হালালকে হারাম করে দেয় না।" (তাবারানী ও দারুকুতনী) অর্থাৎ একটি বেআইনী কাজ অন্য একটি আইনসঙ্গত কাজকে বেআইনী করে দেয় না। কাজেই কোন ব্যক্তির যিনা করার কারণে সে যদি বিয়েও করে তাহলে তা তাকে যিনায় পরিণত করে দিতে পারে না এবং বিবাহ চুক্তির দ্বিতীয় পক্ষ যে ব্যভিচারী নয় সেও ব্যভিচারী গণ্য হবে না। নীতিগতভাবে বিদ্রোহ ছাড়া কোন অপরাধ এমন নেই, যা অপরাধ সম্পাদনকারীকে নিষিদ্ধ ব্যক্তিতে (Outlaw) পরিণত করে। যার পরে তার কোন কাজই আইনসঙ্গত হতে পারে না। এ বিষয়টি সামনে রেখে যদি আয়াত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা যায়, তাহলে আসল উদ্দেশ্য পরিষ্কারভাবে এই মনে হয় যে, যাদের ব্যভিচারী চরিত্র জনসমক্ষে পরিচিত তাদেরকে বিয়ে করার জন্য নির্বাচিত করা একটি গোনাহর কাজ। মু' মিনদের এ গোনাহ থেকে দূরে থাকা উচিত। কারণ এর মাধ্যমে ব্যভিচারীদের হিম্মত বাড়িয়ে দেয়া হয়। অথচ শরীয়াত তাদেরকে সমাজের অবাঞ্ছিত ও ঘৃণ্য জীব গণ্য করতে চায়।

অনুরূপভাবে এ আয়াত থেকে এ সিদ্ধান্তও টানা যায় না যে, যিনাকারী মুসলিম পুরুষের বিয়ে মুশরিক নারীর সাথে এবং যিনাকারীনী মুসলিম নারীর বিয়ে মুশরিক পুরুষের সাথে সঠিক হবে। আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা বলা যে, যিনা একটি চরম নিকৃষ্ট কুকর্ম। যে ব্যক্তি মুসলমান হয়েও এ কাজ করে সে মুসলিম সমাজের সৎ ও পাক-পবিত্র লোকদের সাথে আত্মীয় সম্পর্ক গড়ে তোলার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। তার নিজের মতো যিনাকারীদের সাথেই আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে তোলা উচিত অথবা মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা উচিত, যারা আদৌ আল্লাহর বিধানের প্রতি বিশ্বাসই রাখে না।

এ প্রসঙ্গে নবী ﷺ থেকে যেসব হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে সেগুলোই আসলে আয়াতের সঠিক অর্থ প্রকাশ করে। মুসনাদে আহমাদ ও নাসাঈতে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আসের (রাঃ) রেওয়ায়াত উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, উম্মে মাহ্যাওল নামে একটি মেয়ে পতিতাবৃত্তি অবলম্বন করেছিল। এক মুসলমান তাকে বিয়ে করতে চায় এবং এজন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অনুমতি চায়। তিনি নিষেধ করে এ আয়াতটি পড়েন। তিরমিযী ও আবু দাউদে বলা হয়েছে, মারসাদ ইবনে আবি মারসাদ একজন সাহাবী ছিলেন। জাহেলী যুগে মক্কার ঈনাক নামক এক ব্যভিচারিণীর সাথে তার অবৈধ সম্পর্ক ছিল। পরে তিনি তাকে বিয়ে করার ইচ্ছা করেন এবং রসূলুল্লাহর ﷺ কাছে অনুমতি চান। দু' বার জিজ্ঞেস করার পরও তিনি নীরব থাকেন। আবার তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করেন, এবার তিনি জবাব দেনঃ

يا مرثد الزَّانِى لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً فلاَ يَنْكِحُهَا "হে মারসাদ! ব্যভিচারী এক ব্যভিচারিণী বা মুশরিক নারী ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না, কাজেই তাকে বিয়ে করো না।"

এছাড়াও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) ও হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) থেকেও বিভিন্ন হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। সেগুলোতে বলা হয়েছে, নবী ﷺ বলেছেনঃ "কোন দাইয়ুস (অর্থাৎ যে ব্যক্তি জানে তার স্ত্রী ব্যভীচারিনী এবং এরপরও সে তার স্বামী থাকে) জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে না।" (আহমাদ, নাসাঈ, আবু দাউদ) প্রথম দুই খলীফা হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত উমর (রাঃ) উভয়ই এ ব্যাপারে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেন তা ছিল এই যে, তাঁদের আমলে যে অবিবাহিত পুরুষ ও নারী যিনার অভিযোগে গ্রেফতার হতো তাদেরকে তাঁরা প্রথমে বেত্রাঘাতের শাস্তি দিতেন তারপর তাদেরকেই পরস্পরের সাথে বিয়ে দিয়ে দিতেন। ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদিন এক ব্যক্তি বড়ই পেরেশান অবস্থায় হযরত আবু বকরের (রাঃ) কাছে আসে। সে এমনভাবে কথা বলতে থাকে যেন তার মুখে কথা ভালভাবে ফুটছিল না। হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত উমরকে (রাঃ) বলেন ওকে অন্য জায়গায় নিয়ে গিয়ে একান্তে জিজ্ঞেস করুন ব্যাপারখানা কি? হযরত উমর (রাঃ) জিজ্ঞেস করতে সে বলে, তাদের বাড়িতে মেহমান হিসেবে এক ব্যক্তি এসেছিল। সে তার মেয়ের সাথে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করে বসেছে। হযরত উমর (রাঃ) বলেনঃ قَبَّحَكِ اللهُ الا سترت على ابْنَتَكَ "তোমার মন্দ হোক, তুমি নিজের মেয়ের আবরণ ঢেকে দিলে না? " শেষ পর্যন্ত পুরুষটি ও মেয়েটির বিরুদ্ধে মামলা চলে। উভয়কে বেত্রাঘাতের শাস্তি দেয়া হয়। তারপর উভয়কে পরস্পরের সাথে বিয়ে দিয়ে হযরত আবু বকর (রাঃ) এক বছরের জন্য তাদেরকে দেশান্তর করেন। এ ধরনেরই আরো কয়েকটি ঘটনা কাযী আবু বকর ইবনুল আরাবী তাঁর আহকামুল কুরআন গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন (পৃষ্ঠা ৮৬, ২য় খণ্ড)।

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۙ ২৪ : ৪

৪. আর যারা সচ্চরিত্রা নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারপর তারা চারজন সাক্ষী নিয়ে না আসে, তাদেরকে তোমরা আশিটি বেত্রাঘাত কর এবং তোমরা কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না; এরাই তো ফাসেক।

محصنات শব্দটি إحصان থেকে উদ্ভূত। শরীয়তের পরিভাষায় إحصان 'ইহসান' দুই প্রকার। একটি ব্যভিচারের শাস্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং অপরটি অপবাদ আরোপের শাস্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ব্যভিচারের শাস্তির ক্ষেত্রে إحصان এই যে, যার বিরুদ্ধে ব্যভিচার প্রমাণিত হয়, তাকে জ্ঞান সম্পন্ন, বালেগ, মুক্ত ও মুসলিম হতে হবে এবং শরীয়ত সম্মত পন্থায় কোন নারীকে বিয়ে করে তার সাথে সঙ্গমও হতে হবে। এরূপ ব্যক্তি যিনা করলে তার প্রতি রজম তথা প্রস্তরাঘাতে হত্যার শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে অপবাদ আরোপের শাস্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য إحصان এই যে, যে ব্যক্তির প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করা হয়, তাকে জ্ঞান সম্পন্ন বালেগ, মুক্ত ও মুসলিম হতে হবে, সৎ হতে হবে অর্থাৎ পূর্বে কখনো তার বিরুদ্ধে ব্যভিচার প্রমাণিত হয়নি। [দেখুন: কুরতুবী, বাগভী, সাদী, যাদুল মাসির]

) যে ব্যক্তি অন্যের বিরুদ্ধে যিনার অভিযোগ আনে, সে সাক্ষ্য-প্রমাণের মাধ্যমে নিজের অভিযোগ প্রমাণ করবে। আর যদি প্রমাণ করতে না পারে তাহলে তাকে আশি ঘা বেত্রাঘাত করো, যাতে ভবিষ্যতে আর সে কখনো এ ধরনের কোন কথা বিনা প্রমাণে নিজের মুখ থেকে বের করার সাহস না করে। আর তাদের সাক্ষ্য কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না। [ইবন কাসীর, মুয়াসসার]

সচ্চরিত্রা ও নির্দোষ নারীর চরিত্রে মিথ্যা অপবাদ (কাজফ) দেওয়া এবং গুজব ছড়ানোর ভয়াবহতা সম্পর্কে কুরআনের অন্যান্য আয়াত ও সহীহ হাদিসে কঠোর হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

• দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশাপ: সূরা আন-নূর (আয়াত ২৩)-এ আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয়ই যারা সচ্চরিত্রা, সরলমনা ও ঈমানদার নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।"

· অশ্লীলতা ও গুজব প্রচারের শাস্তি: সূরা আন-নূর (আয়াত ১৯)-এ বলা হয়েছে, "যারা পছন্দ করে যে, মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার ঘটুক, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"

· মুমিনদের কষ্ট দেওয়ার পরিণাম: সূরা আল-আহযাব (আয়াত ৫৮)-এ ইরশাদ হয়েছে, "যারা বিনা অপরাধে মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের কষ্ট দেয়, তারা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে।"

• সাতটি ধ্বংসাত্মক কবিরা গুনাহের একটি: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক পাপ থেকে বেঁচে থাকো।" সাহাবায়ে কেরাম সেগুলো কী জানতে চাইলে তিনি যে সাতটি পাপের কথা উল্লেখ করেন, তার সপ্তমটি হলো– "সতী-সাধ্বী, সরলমনা মুমিন নারীদের প্রতি ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ দেওয়া" (সহীহ বুখারী: ২৭৬৬, সহীহ মুসলিম: ৮৯)।

· পরকালে নিঃস্ব হওয়ার কারণ (মুফলিস): সহীহ মুসলিমের (হাদিস: ২৫৮১) একটি প্রসিদ্ধ হাদিসে রাসূল (সা.) জানিয়েছেন, কিয়ামতের দিন এমন ব্যক্তি উপস্থিত হবে যে নামাজ, রোজা ও যাকাত আদায় করেছে; কিন্তু দুনিয়াতে কাউকে গালি দিয়েছে, কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে এবং অন্যায়ভাবে কারো হক নষ্ট করেছে। তখন তার নেক আমলগুলো ভুক্তভোগীদের দিয়ে দেওয়া হবে এবং নেক আমল শেষ হয়ে গেলে ভুক্তভোগীদের গুনাহ তার কাঁধে চাপিয়ে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

• না জেনে কথা বলার ভয়াবহতা: সহীহ বুখারীতে (হাদিস: ৬৪৭৭) বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (সা.) বলেছেন, "বান্দা অনেক সময় আল্লাহর অসন্তুষ্টিমূলক এমন কথা (বা অপবাদ) বলে ফেলে, যার পরিণতি সম্পর্কে সে চিন্তাও করে না; অথচ এই কথার কারণেই সে জাহান্নামের এত গভীরে নিক্ষিপ্ত হবে, যা পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্বের চেয়েও বেশি।"

فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ❤بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا ۙاِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ ۵ : ২৪

৫. তবে যারা এরপর তাওবা করে ও নিজেদেরকে সংশোধন করে, তাহলে আল্লাহ তো অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তওবার কারণে বেত্রাঘাতের শাস্তি তো ক্ষমা হবে না, সে তওবা করুক বা না করুক বেত্রাঘাতের শাস্তি তাকে ভোগ করতেই হবে। তবে অন্য দুই বিধান (সাক্ষ্য গ্রহণ না করা ও ফাসেক হওয়া) সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কিছু উলামা বলেছেন যে, তওবার পর সে ফাসেক থাকবে না; তবে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। আবার কিছু উলামা বলেছেন, তওবার পর ফাসেক থাকবে না এবং তার সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য হবে। ইমাম শাওকানী (রঃ) দ্বিতীয় মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। আর أَبَدًا (কখনও) শব্দের অর্থ বলেছেন, যতক্ষণ সে অপবাদ দেওয়ার কাজে সক্রিয় থাকবে। যেমন বলা হয়, কাফেরের সাক্ষ্য কখনই গ্রহণীয় নয়। এখানে 'কখনই' বলতে সে যতক্ষণ কাফের থাকবে।

আয়াতটির মূল তাৎপর্য ও বিধানসমূহ:

· ক্ষমা ও রহমতের দরজা খোলা: কোনো ব্যক্তি মিথ্যা অপবাদের মতো গুরুতর পাপ করার পরও যদি আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয় এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, তবে আল্লাহ তার পাপ ক্ষমা করে দেবেন।

· তাওবার পাশাপাশি 'সংশোধন' (ইসলাহ) অপরিহার্য: এখানে শুধু মৌখিক তাওবার কথা বলা হয়নি, বরং "নিজেদেরকে সংশোধন করে" নেওয়ার শর্ত দেওয়া হয়েছে। মিথ্যা অপবাদের ক্ষেত্রে সংশোধনের অর্থ হলো–নিজের মিথ্যাচার প্রকাশ্যে স্বীকার

করা, যার বিরুদ্ধে অপবাদ দেওয়া হয়েছিল তার সম্মান ফিরিয়ে দেওয়া এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজ থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকা।

· তাওবার পর ফাসেক উপাধি দূর হওয়া: আলেমদের সর্বসম্মত মত অনুযায়ী, খাঁটি তাওবা ও সংশোধনের পর তার ওপর আরোপিত 'ফাসেক' (সত্যত্যাগী) উপাধিটি উঠে যায় এবং আল্লাহর কাছে সে পাপমুক্ত হয়ে যায়।

· সাক্ষ্য গ্রহণের ব্যাপারে ফিকহি মতপার্থক্য: তাওবা করার পর ভবিষ্যতে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে কি না, এ নিয়ে ইসলামি আইনজ্ঞদের (ফকিহ) দুটি মত রয়েছে:

• অধিকাংশ আলেমের মত (ইমাম মালিক, শাফেয়ী ও আহমদ): খাঁটি তাওবা ও নিজেকে সংশোধন করলে তার সাক্ষ্য পুনরায় গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ এই আয়াতে তাওবাকারীদের পূর্বের আয়াতের শাস্তি ও অযোগ্যতা থেকে ব্যতিক্রম করা হয়েছে।

• হানাফি মাজহাবের মত: তাওবা করলে পরকালীন শাস্তি মাফ হবে এবং সে আর ফাসেক থাকবে না; তবে দুনিয়ার আইনি দণ্ড হিসেবে তার সাক্ষ্য আর কখনো গ্রহণ করা হবে না (কারণ ৪ নম্বর আয়াতে 'কখনো গ্রহণ করবে না' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, এবং ৮০টি বেত্রাঘাতও তাওবার কারণে মাফ হয় না)।

• وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ اِلَّآ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍۢ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ٢٤ : ٦

৬. আর যারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথচ নিজেরা ছাড়া তাদের কোন সাক্ষী নেই, তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এ হবে যে, সে আল্লাহর নামে চারবার শপথ করে বলবে যে, সে নিশ্চয় সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত,

وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ٢٤ : ٧

৭. এবং পঞ্চমবারে বলবে যে, সে মিথ্যাবাদী হলে তার উপর নেমে আসবে আল্লাহর লা' নত।

এখানে 'লিআন' এর বিধান বর্ণনা করা হয়েছে।

যার অর্থ হলঃ কোন পুরুষ নিজ স্ত্রীকে নিজের চোখে অন্য কোন পুরুষের সাথে কুকর্মে লিপ্ত দেখে, যার প্রতক্ষ্যদর্শী সে নিজেই। কিন্তু ব্যভিচারের শাস্তি সাব্যস্ত করার জন্য চারজন সাক্ষীর প্রয়োজন। সেই কারণে নিজের সঙ্গে অতিরিক্ত তিনজন সাক্ষী সংগ্রহ না করতে পারলে স্ত্রীর উপর ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে না। কিন্তু নিজের চোখে দেখার পর এ রকম অসতী স্ত্রী নিয়ে সংসার করাও সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় শরীয়তে এর সমাধান দিয়েছে যে, স্বামী আদালতে কাযীর সামনে চারবার আল্লাহর নামে কসম (শপথ) করে বলবে যে, সে তার স্ত্রী উপর ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়ায় সত্যবাদী। অথবা স্ত্রীর এই সন্তান বা গর্ভ তার নয়। আর পঞ্চমবারে বলবে যে, 'আমি যদি এ ব্যাপারে মিথ্যাবাদী হই, তাহলে আমার উপর আল্লাহর অভিশাপ হোক।' (অনুরূপ স্ত্রীও নিজের উপর লা' নত বা অভিশাপ দেবে। আর স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের এই লা' নত দেওয়ার নামই 'লিআন' ।)

• وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍۢ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ٢٤ : ٨

৮. আর স্ত্রী লোকটির শাস্তি রহিত হবে যদি সে চারবার আল্লাহর নামে শপথ করে সাক্ষ্য দেয় যে, নিশ্চয় তার স্বামীই মিথ্যাবাদী,

وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَآ اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ٢٤ : ٩

৯. এবং পঞ্চমবারে বলবে যে, তার স্বামী সত্যবাদী হলে তার নিজের উপর নেমে আসবে আল্লাহর গযব।

যখন কোন স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দেয় অথবা সন্তান সম্পর্কে বলে যে, সে আমার শুক্রজাত নয়, অপরপক্ষে স্ত্রী স্বামীকে মিথ্যাবাদী অভিহিত করে দাবী করে যে, তাকে মিথ্যা অপবাদের শাস্তি আশিটি বেত্রাঘাত প্রদান করা হোক, তখন স্বামীকে স্বপক্ষে চার জন সাক্ষী উপস্থিত করাতে বলা হবে। সে যদি যথাবিহিত চার জন সাক্ষী পেশ করে যারা স্ত্রীর ব্যভিচারের পক্ষে এমনভাবে সাক্ষ্য দিবে যে স্ত্রীর ব্যভিচার বিচারকের কাছে প্রমাণিত হয়ে পড়ে, তখন স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারের হদ প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে সে চার জন সাক্ষী পেশ করতে না পারলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে লি' আন করানো হবে। প্রথমে স্বামীকে বলা হবে যে, সে কুরআনে উল্লেখিত ভাষায় চার বার সাক্ষ্যদান করুক যে, সে এ ব্যাপারে সত্যবাদী এবং পঞ্চম বার বলুক যে, সে মিথ্যাবাদী হলে তার প্রতি আল্লাহর লা'নত বা অভিশাপ বর্ষিত হবে।

স্বামী যদি এসব কথা থেকে বিরত থাকে, তবে যে পর্যন্ত নিজের মিথ্যাবাদী হওয়ার কথা স্বীকার না করে অথবা উপরোক্ত ভাষায় পাঁচ বার কসম না করে, সে পর্যন্ত তাকে আটক রাখা হবে। সে যদি মিথ্যাবাদী হওয়ার কথা স্বীকার করে, তবে তার উপর অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে যদি পাঁচ বার কসম করে নেয়, তবে স্ত্রীর কাছ থেকেও কুরআনে বর্ণিত ভাষায় পাঁচ বার কসম করিয়ে নেয়া হবে। যদি সে কসম করতে অস্বীকার করে, তবে যে পর্যন্ত সে স্বামীর কথার সত্যতা স্বীকার না করে এবং নিজের ব্যভিচারের অপরাধ স্বীকার না করে, সে পর্যন্ত তাকে আটক রাখা হবে। আর এরূপ স্বীকারোক্তি করলে তার উপর ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে।

পক্ষান্তরে যদি উপরোক্ত ভাষায় কসম করতে সম্মত হয়ে যায় এবং কসম করে নেয়, তবে লি'আন পূর্ণতা লাভ করবে। এর ফলশ্রুতিতে দুনিয়ার শাস্তির কবল থেকে উভয়েই বেঁচে যাবে। আখেরাতের ব্যাপার আল্লাহ তা'আলাই জানেন যে, তাদের মধ্যে কে মিথ্যাবাদী। মিথ্যাবাদী আখেরাতের শাস্তি ভোগ করবে। কিন্তু দুনিয়াতেও যখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে লি' আন হয়ে গেল, তখন তারা একে অপরের জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যাবে। বিচারক উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেবেন। এটা তালাকেরই অনুরূপ হবে। এখন তাদের মধ্যে পুনর্বিবাহও হতে পারবে না। **[ইবন কাসীর, কুরতুবী, সাদী]**

হাদীসের কিতাবাদিতে লি'আন সংক্রান্ত দু' টি ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে।

একটি ঘটনা হেলাল ইবন উমাইয়া ও তার স্ত্রীর, যা সহীহ বুখারীতে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমার বর্ণনায় রয়েছে। এ ঘটনার প্রাথমিক অংশ ইবনে আব্বাসেরই বর্ণনায় মুসনাদে আহমাদে এভাবে রয়েছে- ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেনঃ যখন কুরআনে অপবাদের হদ সম্পর্কিত (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً) আয়াত নাযিল হল, তখন মুসলিমদের মধ্যে কিছুটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। কারণ এতে কোন নারীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপকারী পুরুষের জন্য জরুরী করা হয়েছে যে, হয় সে স্বপক্ষে চার জন সাক্ষী উপস্থিত করবে, তন্মধ্যে এক জন সে নিজে হবে, না হয় তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে আশিটি বেত্রাঘাত করা হবে এবং চিরতরে তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হবে। এ আয়াত শুনে আনসারদের সর্দার সা'দ ইবনে উবাদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল, এ আয়াতগুলো ঠিক এভাবেই নাযিল হয়েছে?

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সা'দ ইবনে উবাদার মুখে এরূপ কথা শুনে বিস্মিত হলেন। তিনি আনসারদেরকে সম্বোধন করে বললেনঃ তোমরা কি শুনলে, তোমাদের সর্দার কি কথা বলছেন? আনসারগণ বললঃ হে আল্লাহর রাসূল, আপনি তাকে তিরস্কার করবেন না। তার একথা বলার কারণ তার তীব্র আত্মমর্যাদাবোধ। অতঃপর সা' দ ইবনে উবাদা নিজেই বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল, আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ, আমার পুরোপুরি বিশ্বাস রয়েছে যে, আয়াতগুলো সত্য এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই নাযিল করা হয়েছে। কিন্তু আমি আশ্চর্য বোধ করি যে, যদি আমি লজ্জাহীনা স্ত্রীকে এমতাবস্থায় দেখি যে, তার উপর ভিন্ন পুরুষ সওয়ার হয়ে আছে, তখন কি আমার জন্য বৈধ হবে না যে, আমি তাকে শাসন করি এবং সেখান থেকে

সরিয়ে দেই; না আমার জন্য এটা জরুরী যে, আমি চার জন লোক এনে এটা দেখাই এবং সাক্ষী করি? যতক্ষণে আমি সাক্ষী সংগ্রহ করব, ততক্ষণে কি তারা উদ্দেশ্য সাধন করে পলায়ন করবে না?

সাদ ইবনে উবাদার এ কথাবার্তার অল্পদিন পরেই একটি ঘটনা সংঘটিত হল। হেলাল ইবনে উমাইয়া এশার সময় ক্ষেত থেকে ফিরে এসে স্ত্রীর সাথে এক জন পুরুষকে স্বচক্ষে দেখলেন এবং তাদের কথাবার্তা নিজ কানে শুনলেন। কিন্তু কিছুই বললেন না। সকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি খুব দুঃখিত হলেন এবং ব্যাপারটিকে গুরুতর মনে করলেন। এদিকে আনসারগণ একত্রিত হয়ে বলতে লাগল যে, আমাদের সর্দার সা'দ যে কথা বলেছিলেন, এক্ষণে আমরা তাতেই লিপ্ত হয়ে পড়লাম। এখন শরীয়তের আইন অনুযায়ী রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেলাল ইবনে উমাইয়াকে আশিটি বেত্রাঘাত করবেন এবং জনগণের মধ্যে চিরতরে তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হবে। কিন্তু হেলাল ইবনে উমাইয়া জোর দিয়ে বললেনঃ আল্লাহর কসম! আমার পূর্ণ বিশ্বাস যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন।

বুখারীর বর্ণনায় আরো বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেলালের ব্যাপার শুনে কুরআনের বিধান মোতাবেক তাকে বলেও দিয়েছিলেন যে, হয় দাবীর স্বপক্ষে চার জন সাক্ষী উপস্থিত কর, না হয় তোমার পিঠে অপবাদের শাস্তিস্বরূপ আশিটি বেত্রাঘাত পড়বে। হেলাল উত্তরে বললেনঃ যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর কসম, আমি আমার কথায় সত্যবাদী এবং আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই এমন কোন বিধান নাযিল করবেন, যা আমার পিঠকে অপবাদের শাস্তি থেকে মুক্ত করে দেবে। [বুখারীঃ ৪৭৪৭, ৫৩০৭] এই কথাবার্তা চলছিল এমতাবস্থায় জিবরীল আলাইহিস সালাম লি'আনের আইন সম্বলিত আয়াত নিয়ে নাযিল হলেন, অর্থাৎ (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ)।

আবু ইয়ালা এই বর্ণনাটিই আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। এতে আরো বলা হয়েছে যে, লি' আনের আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেলাল ইবনে উমাইয়াকে সুসংবাদ দিলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার সমস্যার সমাধান নাযিল করেছেন। হেলাল বললেনঃ আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে এই আশাই পোষণ করেছিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেলালের স্ত্রীকে ডেকে আনলেন। স্বামী-স্ত্রীর উপস্থিতিতে স্ত্রীর জবানবন্দী নেয়া হল। সে বললঃ আমার স্বামী হেলাল ইবনে উমাইয়া আমার প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমাদের মধ্যে একজন যে মিথ্যাবাদী, তা আল্লাহ তা' আলা জানেন। জিজ্ঞাস্য এই যে, তোমাদের কেউ কি আল্লাহর আযাবের ভয়ে তাওবাহ করবে এবং সত্য কথা প্রকাশ করবে? হেলাল বললেনঃ আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ, আমি সম্পূর্ণ সত্য কথা বলছি।

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়াত অনুযায়ী উভয়কে লি' আন করানোর আদেশ দিলেন। প্রথমে হেলালকে বলা হল যে, তুমি কুরআনের বর্ণিত ভাষায় চার বার সাক্ষ্য দাও; অর্থাৎ আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বিশ্বাস করে বলছি যে, আমি সত্যবাদী। হেলাল আদেশ অনুযায়ী চার বার সাক্ষ্য দিলেন। পঞ্চম সাক্ষ্যের কুরআনী ভাষা এরূপঃ "যদি আমি মিথ্যা বলি, তবে আমার প্রতি আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হবে।" এই সাক্ষ্যের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেলালকে বললেনঃ দেখ হেলাল, আল্লাহকে ভয় কর। কেননা, দুনিয়ার শাস্তি আখেরাতের শাস্তির তুলনায় অনেক হাল্কা। আল্লাহর আযাব মানুষের দেয়া শাস্তির চাইতে অনেক কঠোর। এই পঞ্চম সাক্ষ্যই শেষ সাক্ষ্য। এর ভিত্তিতেই ফয়সালা হবে। কিন্তু হেলাল বললেনঃ আমি কসম করে বলতে পারি যে, আল্লাহ্ তাআলা আমাকে এই সাক্ষ্যের কারণে আখেরাতের আযাব দেবেন না।

এরপর তিনি পঞ্চম সাক্ষ্যের শব্দগুলোও উচ্চারণ করে দিলেন। অতঃপর হেলালের স্ত্রীর কাছ থেকেও এমনি ধরনের চার সাক্ষ্য অথবা কসম নেয়া হল। পঞ্চম সাক্ষ্যের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ একটু থাম। আল্লাহকে ভয় কর। এই সাক্ষ্যই শেষ সাক্ষ্য। আল্লাহর আযাব মানুষের আযাব অর্থাৎ ব্যভিচারের শাস্তির চাইতেও অনেক কঠোর। এ কথা শুনে সে কসম করতে ইতস্ততঃ করতে লাগল। এ অবস্থায় কিছুক্ষণ অতিবাহিত হলে অবশেষে সে বললঃ আল্লাহর কসম আমি আমার গোত্রকে চিরদিনের জন্য লাঞ্ছিত করব না। অতঃপর সে পঞ্চম সাক্ষ্যও একথা বলে দিয়ে দিল যে, আমার স্বামী সত্যবাদী হলে আমার উপর আল্লাহর গজব বা ক্রোধ আপতিত হবে। এভাবে লিআনের কার্যধারা সমাপ্ত হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বামী-স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন অর্থাৎ তাদের বিয়ে নাকচ করে দিলেন। তিনি আরো ফয়সালা দিলেন যে,

এই গর্ভ থেকে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, সে এই স্ত্রীর সন্তান বলে কথিত হবে- পিতার সাথে সম্বন্ধযুক্ত হবে না। কিন্তু সন্তানটিকে ধিকৃতও করা হবে না। [মুসনাদে আহমাদঃ ১/২৩৮-২৩৯, আবু দাউদঃ ২২৫৬, আবু ইয়া'লাঃ ২৭৪০]

বুখারী ও মুসলিমে সাহল ইবনে সা'দ সায়েদীর বর্ণনা এভাবে আছে যে, ওয়াইমের আজলানী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল, যদি কেউ তার স্ত্রীকে ভিন্ন পুরুষের সাথে দেখে, তবে সে কি তাকে হত্যা করবে, যার ফলে তাকেও হত্যা করা হবে? বা তার কি করা উচিত? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা তোমার এবং তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে বিধান নাযিল করেছেন। যাও স্ত্রীকে নিয়ে এস। বর্ণনাকারী সাহল বলেনঃ তাদেরকে এনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের মধ্যে লি' আন করালেন। যখন উভয় পক্ষ থেকে পাঁচটি সাক্ষ্য পূর্ণ হয়ে লিআন সমাপ্ত হল, তখন ওয়াইমের বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল, এখন যদি আমি তাকে স্ত্রীরূপে রাখি, তবে এর অর্থ এই হয় যে, আমি তার প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছি। তারপর তিনি তাকে তালাক দিয়ে দিলেন। [বুখারীঃ ৪৭৪৫, ৪৭৪৬, ৫৩০৯, মুসলিমঃ ১৪৯২]

আলোচ্য ঘটনাদ্বয়ের মধ্য থেকে প্রত্যেকটি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, লি' আনের আয়াত এর পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে। হাফেয ইবনে হাজার ও ইমাম বগভী উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানকল্পে বলেছেন যে, মনে হয় প্রথম ঘটনা হেলাল ইবনে উমাইয়ার ছিল এবং লি' আনের আয়াত এরই পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে। এরপর ওয়াইমের এমনি ধরনের ঘটনার সম্মুখীন হয়। হেলাল ইবনে উমাইয়ার ঘটনা তার জানা ছিল না। কাজেই এ ব্যাপারটি যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পেশ করা হল তখন তিনি বললেনঃ তোমার ব্যাপারে ফয়সালা এই। এর স্বপক্ষে ইঙ্গিত এই যে, হেলাল ইবনে উমাইয়ার ঘটনায় হাদীসের ভাষা হচ্ছে فَنَزَلَ جِبْرَئِيْلُ এবং ওয়াইমেরের ঘটনায় ভাষা হচ্ছে قَدْ نَزَّلَ اللهُ فِيْكَ এর অর্থ এরূপও হতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার অনুরূপ এক ঘটনায় এর বিধান নাযিল করেছেন।

উপরোক্ত দু'টি বর্ণনা ছাড়াও লি'আন সংক্রান্ত আরো কিছু হাদীস এসেছে যেগুলো থেকে লি' আনের গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা সাব্যস্ত হয়েছে। যেমন, ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, স্বামী-স্ত্রী লি' আন শেষ করার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি করে দেন। [বুখারীঃ ৫৩০৬, ৪৭৪৮, মুসনাদে আহমদঃ ২/৫৭] ইবনে উমরের অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, এক ব্যক্তি ও তার স্ত্রীর মধ্যে লি' আন করানো হয়। তারপর স্বামীটি গর্ভের সন্তান অস্বীকার করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি করে দেন এবং ফায়সালা শুনিয়ে দেন, সন্তান হবে শুধুমাত্র মায়ের। [বুখারীঃ ৫৩১৫, ৬৭৪৮]

ইবনে উমরের আর একটি বর্ণনায় এসেছে যে, উভয়ে লি' আন করার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তোমাদের হিসাব এখন আল্লাহর জিম্মায়। তোমাদের একজন অবশ্যই মিথ্যুক।" তারপর তিনি পুরুষটিকে বলেন, এখন এ আর তোমার নয়। তুমি এর উপর নিজের কোন অধিকার দেখাতে পারো না। এর উপর কোনরকম হস্তক্ষেপও করতে পারো না। অথবা এর বিরুদ্ধে অন্য কোন প্রকার প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করার অধিকারও আর তোমার নেই। পুরুষটি বলে, হে আল্লাহর রসূল! আর আমার সম্পদ? (অর্থাৎ যে মোহরানা আমি তাকে দিয়েছিলাম তা আমাকে ফেরত দেবার ব্যবস্থা করুন)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "সম্পদ ফেরত নেবার কোন অধিকার তোমার নেই। যদি তুমি তার উপর সত্য অপবাদ দিয়ে থাকো তাহলে ঐ সম্পদ সে আনন্দ উপভোগের প্রতিদান যা তুমি হালাল করে তার থেকে লাভ করেছো। আর যদি তুমি তার উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়ে থাকো তাহলে সম্পদ তোমার কাছ থেকে আরো অনেক দূরে চলে গেছে। তার তুলনায় তোমার কাছ থেকে তা বেশী দূরে রয়েছে।" [বুখারীঃ ৫৩৫০]

অপর বর্ণনায় আলী ইবন আবু তালেব ও ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেনঃ "সুন্নাত এটিই নির্ধারিত হয়েছে যে, লি' আনকারী স্বামী-স্ত্রী পরবর্তী পর্যায়ে আর কখনো বিবাহিতভাবে একত্র হতে পারে না।" [দারুকুতনী ৩/২৭৬] আবদুল্লাহ ইবনে

আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এরা দু’ জন আর কখনো একত্র হতে পারে না। [দারুকুতুনীঃ ৩/২৭৬] লি’আনের উপযুক্ত আয়াত এবং এ হাদীসগুলোর আলোকে ফকীহগণ লি’আনের বিস্তারিত আইন-কানুন তৈরী করেছেন। এ আইনের গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলো হচ্ছেঃ

একঃ যে ব্যক্তি স্ত্রীর ব্যভিচার স্বচক্ষে দেখে লি’আনের পথ অবলম্বন না করে হত্যা করে বসে তার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। একটি দল বলে, তাকে হত্যা করা হবে। কারণ নিজের উদ্যোগে ‘হদ’ জারি করার তথা আইন হাতে তুলে নেয়ার অধিকার তার ছিল না। দ্বিতীয় দল বলে, তাকে হত্যা করা হবে না এবং তার কর্মের জন্য তাকে জবাবদিহিও করতে হবে না, তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে তার দাবীর সত্যতা প্রমাণিত হতে হবে (অর্থাৎ যথার্থই সে তার যিনার কারণে এ কাজ করেছে)। ইমাম আহমদ ও ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ বলেন, এটিই হত্যার কারণ এ মর্মে তাকে দু’ জন সাক্ষী আনতে হবে। মালেকীদের মধ্যে ইবনুল কাসেম ও ইবনে হাবীব এ মর্মে অতিরিক্ত শর্ত আরোপ করেন যে, যাকে হত্যা করা হয়েছে সেই যিনাকারীর বিবাহিত হতে হবে। অন্যথায় কুমার যিনাকারীকে হত্যা করলে তার কাছ থেকে কিসাস নেয়া হবে। কিন্তু অধিকাংশ ফকীহের মতে তাকে কিসাস থেকে শুধুমাত্র তখনই মাফ করা হবে যখন সে যিনার চারজন সাক্ষী পেশ করবে অথবা নিহত ব্যক্তি মরার আগে নিজ মুখে একথা স্বীকার করে যাবে যে, সে তার স্ত্রীর সাথে যিনা করছিল এবং এ সংগে নিহত ব্যক্তিকে বিবাহিতও হতে হবে।

দুইঃ ঘরে বসে লিআন হতে পারে না। এ জন্য আদালতে যাওয়া জরুরী।

তিনঃ লিআন দাবী করার অধিকার শুধু স্বামীর নয়, স্ত্রীরও। স্বামী যখন তার উপর যিনার অপবাদ দেয় অথবা তার শিশুর বংশধারা মেনে নিতে অস্বীকার করে তখন স্ত্রী আদালতে গিয়ে লি’ আন দাবী করতে পারে।

চারঃ সব স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কি লি’ আন হতে পারে অথবা এ জন্য তাদের দু’জনের মধ্যে কি কিছু শর্ত পাওয়া যেতে হবে? এ বিষয়ে ফকীহদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। ইমাম শাফেঈ বলেন, যার কসম আইনের দিক দিয়ে নির্ভরযোগ্য এবং যার তালাক দেবার ক্ষমতা আছে সে লি’ আন করতে পারে। প্রায় একই ধরনের অভিমত ইমাম মালেক ও ইমাম আহমাদেরও। কিন্তু হানাফীগণ বলেন, লি’ আন শুধুমাত্র এমন স্বাধীন মুসলিম স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে হতে পারে যারা কাযাফের(মিথ্যা অপবাদ) অপরাধে শাস্তি পায়নি। যদি স্বামী ও স্ত্রী দু’ জনই কাফের, দাস বা কাযাফের অপরাধে পূর্বেই শাস্তি প্রাপ্ত হয়ে থাকে, তাহলে তাদের মধ্যে লি’ আন হতে পারে না। এ ছাড়াও যদি স্ত্রীর এর আগেও কখনো হারাম বা সন্দেহযুক্ত পদ্ধতিতে কোন পুরুষের সাথে মাখামাখি থেকে থাকে, তাহলে এ ক্ষেত্রেও লি’ আন ঠিক হবে না।

পাঁচঃ নিছক ইশারা-ইংগিত, রূপক, উপমা বা সন্দেহ-সংশয় প্রকাশের ফলে লি’আন অনিবার্য হয়ে পড়ে না। বরং কেবলমাত্র এমন অবস্থায় তা অনিবার্য হয় যখন স্বামী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় যিনার অপবাদ দেয় অথবা সুস্পষ্ট ভাষায় সন্তানকে নিজের বলে মেনে নিতে অস্বীকার করে।

ছয়ঃ যদি অপবাদ দেবার পর স্বামী কসম খেতে ইতস্তত করে বা ছলনার আশ্রয় নেয় তাহলে ইমাম আবু হানীফার মতে, তাকে বন্দী করতে হবে এবং যতক্ষণ সে লি’ আন না করে অথবা নিজের অপবাদকে মিথ্যা বলে না মেনে নেয় ততক্ষণ তাকে মুক্তি দেয়া হবে না। আর মিথ্যা বলে মেনে নিলে তার বিরুদ্ধে কাযাফের দণ্ড জারি হয়ে যাবে। এর বিপরীতপক্ষে ইমাম মালেক, শাফেঈ এর মতে, লি’ আন করতে ইতস্তত করার ব্যাপারটি নিজেই মিথ্যার স্বীকারোক্তি। ফলে কসম করতে ইতস্তত করলেই তার উপর কাযাফের হদ ওয়াজিব হয়ে যায়।

সাতঃ স্বামীর কসম খাওয়ার পর স্ত্রী যদি লি’ আন করতে ইতস্তত করে, তাহলে হানাফীদের মতে তাকে বন্দী করতে হবে এবং ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে মুক্তি দেয়া যাবে না যতক্ষণ না সে লি’ আন করবে অথবা যিনার স্বীকারোক্তি না করে নেবে। অন্যদিকে উপরোক্ত ইমামগণ বলেন, এ অবস্থায় তাকে রজম করে দেয়া হবে। তারা কুরআনের ঐ উক্তি থেকে যুক্তি পেশ করেন যে, একমাত্র কসম খাওয়ার পরই স্ত্রী শাস্তি মুক্ত হবে। এখন যেহেতু সে কসম খাচ্ছে না, তাই নিশ্চিতভাবেই সে শাস্তির যোগ্য হবে।

আটঃ যদি লি'আনের সময় স্ত্রী গর্ভবতী থাকে তাহলে ইমাম আহমাদের মতে স্বামী গর্ভস্থিত সন্তানকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করুক বা না করুক স্বামীর গর্ভস্থিত সন্তানের দায়মুক্ত হবার এবং সন্তান তার ঔরসজাত গণ্য না হবার জন্য লি' আন নিজেই যথেষ্ট। ইমাম শাফেঈ বলেন, স্বামীর যিনার অপবাদ ও গর্ভস্থিত সন্তানের দায়িত্ব অস্বীকার করা এক জিনিস নয়। এ জন্য স্বামী যতক্ষণ গর্ভস্থিত সন্তানের দায়িত্ব গ্রহণ করতে সুস্পষ্টভাবে অস্বীকার না করবে ততক্ষণ তা যিনার অপবাদ সত্ত্বেও তার ঔরসজাত গণ্য হবে। কারণ স্ত্রী যিনাকারিণী হওয়ার ফলেই বর্তমান গর্ভজাত সন্তানটি যে যিনার কারণে জন্ম নিয়েছে, এটা অপরিহার্য নয়।

নয়ঃ ইমাম মালেক, ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমাদ স্ত্রীর গর্ভধারণকালে স্বামীকে গর্ভস্থিত সন্তান অস্বীকার করার অনুমতি দিয়েছেন এবং এরই ভিত্তিতে লি'আনকে বৈধ বলেন। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা বলেন, যদি স্বামীর অপবাদের ভিত্তি যিনা না হয়ে থাকে বরং শুধু এটাই হয়ে থাকে যে, সে স্ত্রীকে এমন অবস্থায় গর্ভবতী পেয়েছে যখন তার মতে এ গর্ভস্থিত সন্তান তার হতে পারে না তখন এ অবস্থায় লি'আনের বিষয়টিকে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত মূলতবী করে দেয়া উচিত। কারণ অনেক সময় কোন কোন রোগের ফলে গর্ভ সঞ্চার হয়েছে বলে সন্দেহ দেখা দেয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গর্ভসঞ্চার হয় না।

দশঃ যদি পিতা সন্তানের বংশধারা অস্বীকার করে তাহলে লি' আন অনিবার্য হয়ে পড়ে, এ ব্যাপারে সবাই একমত। আবার এ ব্যাপারেও সবাই একমত যে, একবার সন্তানকে গ্রহণ করে নেবার পর পিতার পক্ষে আর তার বংশধারা অস্বীকার করার অধিকার থাকে না। এ অবস্থায় পিতা বংশধারা অস্বীকার করলে কাযাফের শাস্তির অধিকারী হবে।

এগারঃ যদি স্বামী তালাক দেওয়ার পর সাধারণভাবে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর বিরুদ্ধে যিনার অপবাদ দেয় তাহলে ইমাম আবু হানীফার মতে লি' আন হবে না বরং তার বিরুদ্ধে কাযাফের মামলা দায়ের করা হবে। কারণ লি' আন হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর জন্য। আর তালাকপ্রাপ্ত নারীটি তার স্ত্রী নয়। তবে যদি রজ' ঈ তালাক হয় এবং রুজু করার (স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেবার) সময়-কালের মধ্যে সে অপবাদ দেয়, তাহলে ভিন্ন কথা।

বারঃ লি' আনের আইনগত ফলাফলের মধ্য থেকে কোন কোনটার ব্যাপারে সবাই একমত আবার কোন কোনটার ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে। যেসব ফলাফলের ব্যাপারে মতৈক্য হয়েছে সেগুলো হচ্ছেঃ

১. লি' আন অনুষ্ঠিত হলে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই কোন শাস্তি লাভের উপযুক্ত হবে না।

২. স্বামী যদি সন্তানের বংশধারা অস্বীকার করে তাহলে সন্তান হবে একমাত্র মায়ের। সন্তান বাপের সাথে সম্পর্কিত হবে না এবং তার উত্তরাধিকারীও হবে না। মা তার উত্তরাধিকারী হবে এবং সে মায়ের উত্তরাধিকারী হবে।

৩. নারীকে ব্যভিচারিণী এবং তার সন্তানকে জারজ সন্তান বলার অধিকার কারোর থাকবে না। যদিও লি' আনের সময় তার অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যার ফলে তার ব্যভিচারিণী হবার ব্যাপারে কারোর মনে সন্দেহ না থাকে, তবুও তাকে ও তার সন্তানকে একথা বলার অধিকার থাকবে না।

৪. যে ব্যক্তি লি' আনের পরে তার অথবা তার সন্তানের বিরুদ্ধে আগের অপবাদের পুনরাবৃত্তি করবে সে হদের যোগ্য হবে।

৫. নারীর মোহরানা বাতিল হয়ে যাবে না।

৬. ইদ্দত পালনকালে নারী পুরুষের থেকে খোরপোশ ও বাসস্থানের সুবিধা লাভের হকদার হবে না।

৭. নারী ঐ পুরুষের জন্য হারাম হয়ে যাবে।

তাছাড়া, দু'টি বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। এক, লি' আনের পরে পুরুষ ও নারী কিভাবে আলাদা হবে? এ বিষয়ে ইমাম শাফেঈ বলেন, যখনই পুরুষ লি' আন শেষ করবে, নারী জবাবী লি' আন করুক বা না করুক তখনই সংগে সংগেই ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে। ইমাম মালেক, লাইস ইবনে সা' দ ও যুফার বলেন, পুরুষ ও নারী উভয়েই যখন লিআন শেষ করে তখন ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। অন্যদিকে ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ বলেন, লি' আনের ফলে ছাড়াছাড়ি আপনা আপনি হয়ে যায় না বরং আদালত ছাড়াছাড়ি করে দেবার ফলেই ছাড়াছাড়ি হয়। যদি স্বামী নিজেই তালাক দিয়ে দেয় তাহলে ভালো, অন্যথায়

আদালতের বিচারপতি তাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি করার কথা ঘোষণা করবেন। দুই, লি’ আনের ভিত্তিতে আলাদা হয়ে যাবার পর কি তাদের উভয়ের আবার মিলিত হওয়া সম্ভব?

এ বিষয়টিতে ইমাম মালেক, আবু ইউসুফ, শাফেঈ, আহমাদ ইবন হাম্বল বলেন, লি’ আনের মাধ্যমে যে স্বামী-স্ত্রী আলাদা হয়ে গেছে তারা এরপর থেকে চিরকালের জন্য পরস্পরের উপর হারাম হয়ে যাবে। তারা পুনর্বার পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাইলেও কোন অবস্থাতেই পারবে না। উমর, আলী ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমও এ একই মত পোষণ করেন। বিপরীত পক্ষে সাঈদ ইবন মুসাইয়েব, ইবরাহীম নাখঈ, শাবী, সাঈদ ইবনে জুবাইর, আবু হানীফা ও মুহাম্মাদ রাহেমাহুমুল্লাহর মতে, যদি স্বামী নিজের মিথ্যা স্বীকার করে নেয় এবং তার উপর কাযাফের হদ জারি হয়ে যায় তাহলে তাদের দু’জনের মধ্যে পুনর্বার বিয়ে হতে পারে। তারা বলেন, তাদের উভয়কে পরস্পরের জন্য হারামকারী জিনিস হচ্ছে লিআন। যতক্ষণ তারা এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে ততক্ষণ হারামও প্রতিষ্ঠিত থাকবে কিন্তু যখনই স্বামী নিজের মিথ্যা স্বীকার করে নিয়ে শাস্তি লাভ করবে, তখনই লি’ আন খতম হয়ে যাবে এবং হারামও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। [দেখুন: কুরতুবী]

وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاَنَّ اللهَ تَوَّابٌ حَكِيْمٌ ২৪ : ১০

১০. তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে; এবং আল্লাহ তো তাওবা গ্রহণকারী ও প্রজ্ঞাময়।

এখানে বাক্যের বাকী অংশ উহ্য আছে। কারণ, এখানে অনেক কিছুই বর্ণিত হয়েছে। যদি আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ না থাকত, তবে অনেক কিছুই ঘটে যেতে পারত। যদি আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ হিসেবে এ আয়াতসমূহ নাযিল না করা হতো তবে এ সমস্ত বিষয় মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করে দিত। যদি আল্লাহর রহমত না হতো তবে কেউ নিজেদেরকে তাওবার মাধ্যমে পবিত্র করার সুযোগ পেত না। যদি আল্লাহর রহমত না হতো তবে তাদের মধ্যে যারা মিথ্যাবাদী তাদের উপর লা’নত বা গজব নাযিল হয়েই যেত। এ সমস্ত সম্ভাবনার কারণেই আল্লাহ তা’আলা এখানে উত্তরটি উহ্য রেখেছেন। [দেখুন: তাবারী, বাগভী, ফাতহুল কাদীর]

• সূরা আন-নূর (আয়াত ১৪ ও ২০)-এও আল্লাহ একই ভঙ্গিতে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, "দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে, তোমরা যে অপবাদে লিপ্ত হয়েছিলে তার জন্য তোমাদের ওপর মহাশাস্তি আপতিত হতো।"

· অপরাধের পর তাৎক্ষণিক শাস্তি না দেওয়ার রহমত: সূরা আন-নাহল (আয়াত ৬১)-এ আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ যদি মানুষকে তাদের সীমালঙ্ঘনের জন্য (তাৎক্ষণিক) পাকড়াও করতেন, তবে ভূপৃষ্ঠে কোনো বিচরণশীল প্রাণীকেই রেহাই দিতেন না; কিন্তু তিনি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাদের অবকাশ দেন।"

· তাওবা কবুল ও অসীম ক্ষমার ঘোষণা: সূরা আয-যুমার (আয়াত ৫৩)-এ ইরশাদ হয়েছে, "হে আমার বান্দারা, যারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

• আল্লাহর রহমত তাঁর ক্রোধের ওপর প্রবল: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "আল্লাহ যখন সৃষ্টির কাজ সম্পন্ন করলেন, তখন তিনি আরশের ওপর তাঁর কাছে রক্ষিত কিতাবে লিখে রেখেছেন—'নিশ্চয়ই আমার দয়া ও অনুগ্রহ আমার ক্রোধের ওপর বিজয়ী হয়েছে'।" (সহীহ বুখারী: ৩১৯৪, সহীহ মুসলিম: ২৭৫১)।

· বান্দার তাওবায় আল্লাহর সন্তুষ্টি: সহীহ মুসলিমে (হাদিস: ২৭৪৭) বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (সা.) বলেছেন, "মরুভূমিতে হারিয়ে যাওয়া উট ও খাদ্য-পানীয় ফিরে পেয়ে কোনো ব্যক্তি যতটা আনন্দিত হয়, আল্লাহ তাঁর বান্দার তাওবায় তার চেয়েও অনেক বেশি আনন্দিত হন।"

সূরা আন-নূরের ১ম রুকুতে (১ থেকে ১০ নম্বর আয়াত) মূলত ব্যভিচারের শাস্তি, সতী নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদের দণ্ড এবং স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অভিযোগ (লিআন)-এর বিধান বর্ণনা করা হয়েছে।

এই রুকুতে আলোচিত প্রধান বিষয়বস্তুগুলো নিচে আয়াত অনুযায়ী দেওয়া হলো:

১. বিধান পালনের গুরুত্ব (আয়াত ১)

· আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে, এই সূরার বিধানগুলো তিনি নিজেই নাযিল ও ফরজ করেছেন এবং এতে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি রয়েছে, যাতে মানুষ উপদেশ গ্রহণ করে।

২. ব্যভিচার বা জিনার শাস্তি (আয়াত ২-৩)

· শারীরিক দণ্ড (আয়াত ২): অবিবাহিত ব্যভিচারী নারী ও পুরুষ প্রত্যেকের জন্য ১০০টি বেত্রাঘাতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর বিধান কার্যকর করার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের দয়া বা মায়া প্রদর্শন করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং একদল মুমিনের উপস্থিতিতে এই শাস্তি কার্যকর করতে বলা হয়েছে।

· সামাজিক বর্জন (আয়াত ৩): তওবা না করা পর্যন্ত ব্যভিচারী পুরুষ ও নারী কেবল তাদের সমপর্যায়ের (ব্যভিচারী বা মুশরিক) কাউকেই বিয়ে করতে পারবে; সচ্চরিত্রা মুমিনদের জন্য তাদের বিয়ে করা হারাম বা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

৩. সচ্চরিত্রা নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ বা 'কাজফ'-এর বিধান (আয়াত ৪-৫)

· অপবাদের শাস্তি (আয়াত ৪): কোনো সতী নারীর চরিত্রে অপবাদ দিয়ে চারজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী আনতে ব্যর্থ হলে, অপবাদকারীকে ৮০টি বেত্রাঘাত করতে হবে। পাশাপাশি ভবিষ্যতে কখনো তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না এবং সে 'ফাসেক' হিসেবে গণ্য হবে।

· তাওবা ও সংশোধনের সুযোগ (আয়াত ৫): তবে অপবাদ দেওয়ার পর কেউ যদি খাঁটি তাওবা করে এবং নিজেকে সংশোধন করে নেয়, তবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন।

৪. স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অভিযোগ বা 'লিআন'-এর বিধান (আয়াত ৬-১০)

· স্বামীর চারবার শপথ ও পঞ্চমবার অভিশাপ (আয়াত ৬-৭): কোনো স্বামী যদি তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ আনে এবং নিজে ছাড়া অন্য কোনো সাক্ষী না থাকে, তবে সে চারবার আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে যে সে সত্যবাদী, এবং পঞ্চমবার বলবে—সে মিথ্যাবাদী হলে তার ওপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক।

· স্ত্রীর আত্মরক্ষার শপথ (আয়াত ৮-৯): স্বামীর অভিযোগের পর স্ত্রীর ওপর শাস্তি অবধারিত হয়ে যায়। তবে স্ত্রী যদি চারবার আল্লাহর নামে শপথ করে বলে যে তার স্বামী মিথ্যাবাদী, এবং পঞ্চমবার বলে—তার স্বামী সত্যবাদী হলে তার (স্ত্রীর) ওপর আল্লাহর গজব বর্ষিত হোক, তবে সে শাস্তি থেকে বেঁচে যাবে (এবং তাদের মধ্যে চিরতরে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে)।

· আল্লাহর অনুগ্রহ ও প্রজ্ঞা (আয়াত ১০): সবশেষে আল্লাহ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, বান্দাদের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে এই জটিল পরিস্থিতিতে মানুষ বড় বিপদে পড়ে যেত; তিনি তাওবা গ্রহণকারী ও প্রজ্ঞাময়।